নজরুল ও চলচ্চিত্র

সাদ কামালী

নিঃসন্তান রাণী সুনীতি বিষ্ণুর উপাসনা করে, আবার স্বামী রাজা উত্তানপাদের বংশ রক্ষার জন্য রাজকন্যা সুরুচির সঙ্গে স্বামীর বিয়েও দেয়। রাজা উত্তানপাদও বড় রাণী সুনীতিকে ভালোবাসে। ঈর্ষান্বিত সুরুচি উত্তানপাদকে কৌশলে বশ করে সুনীতিকে নির্বাসনে পাঠায় । রাজা উত্তানপাদ একদিন হরিণ শিকারে গিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পথ হারিয়ে সুনীতির কুটিরে আশ্রয় নেয়। যথাসময়ে সুনীতি মা হয় এক পুত্র সন্তানের। পুত্রের নাম রাখে 'ধ্রুব' । ধ্রুব বড় হতে হতেই জানতে পারে সে রাজা উত্তানপাদের পুত্র। সুনীতিকে না জানিয়ে রাজপ্রাসাদে গিয়ে ভিক্ষা চায় ধ্রুব। রাজা ধ্রুবকে কোলে তুলে নিলেও সুরুচি ধ্রুবকে তাড়িয়ে দেয়। জঙ্গলে ফিরে ধ্রুব হরির তপস্যা করে। তপস্যার শক্তিতেই রাজা উত্তানপাদ জঙ্গলের নির্বাসন থেকে রাণী সুনীতি ও পুত্র ধ্রুবকে রাজ্যে সসম্মানে ফিরিয়ে আনে। ১৯৩৪ সালে ১ জানুয়ারি তারিখে কলকাতার ক্রাউন সিনেমা এবং টকী হাউসে মুক্তি পাওয়া সবাক চলচ্চিত্র 'ধ্রুব'র এই হলো কাহিনী সংক্ষেপ। পুরাণের কাহিনী নিয়ে তখন প্রচুর ছবি নির্মিত হতো, নির্বাক যুগেও যেমন হয়েছে। পুরাণের কাহিনী নির্ভর 'ধ্রুব' তেমন উল্লেখযোগ্য হয়তো ছিল না। সবাক 'ধ্রুব' নির্মিত হওয়ার আগে নাট্যকার গিরিশ চন্দ্রের লেখা এই কাহিনী নিয়ে কলকাতার স্টার থিয়েটারে ১৮৮৩ সালের আগস্ট মাসের ১১ তারিখে 'ধ্রুব চরিত' মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে 'ধ্রুব চরিত' নামেই ম্যাডান থিয়েটার নির্বাক ছবি বানিয়ে ছিল। তো 'ধ্রুব' সবাক চিত্রটি গিরিশ চন্দ্রের বহু পরিচিত পুরাণ ভিত্তিক কাহিনীর 'রিমেক' মাত্র। ম্যাডান থিয়েটার এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান পায়োনীয়ার ফিল্মসের রিমেক 'ধ্রুব' বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিশেষ আলোচিত ঘটনা হয়ে ওঠে কারণ তার কেন্দ্রে রয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরেই তখন নজরুল ইসলাম ছিলেন সাহিত্য-সঙ্গীতের আলোচিত, জনপ্রিয় এবং বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। ধ্রুব ছবিতে নজরুলের গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা শুধু আলোচনারই জন্ম দেয় না তৈরি হয় বিতর্কও। ধ্রুব ছবিতে নজরুল নারদ মুনির চরিত্রে অভিনয় করেন। চলচ্চিত্রে এটাই প্রথম অভিনয়। অভিনেতা কবি কাজী নজরুল আর দশজন অভিনেতার মতো জটা চুল দাড়ি, খাটো ধুতি, হাতে বীণা, শীর্ণ গলায় রুদ্রাক্ষের মালা জড়ানো বৃদ্ধ নারদ মুনি সাজলেন না। নজরুল কেমন নারদ মুনির 'মেকাপ কস্টিউম' করেছিলেন তার বর্ণনা শোনা যাক, ধ্রুব ছবিরই সহকারী সঙ্গীত পরিচালক ও অভিনেতা নিত্যানন্দ ঘটক ওরফে নিতাই ঘটকের বরাতে, ...

> "বিদ্রোহী কবি এই চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করলেন। তিনি এই অশীতিপর নারদকে আটাশে নামিয়ে আনলেন। এতোদিনের বার্ধক্য পীড়িত নারদ এবার হলেন তরুণ যুবক। পরনে তার সিল্কের পাড়ওয়ালা গুটানো ধুতি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, মাথায় সুদৃশ্য চুড়া, তাতে ফুলের মালা জড়ানো, হাতে একতারা, পায়ে খড়ম– এ এক অপূর্ব নয়ন মনোহারী নারদ; দেখলে আর চোখ ফেরানো যায় না। বইখানি

©Mukto-Mona
www.mukto-mona.com

> মুক্তি পাবার পর কাগজে কাগজে সমালোচনার ধুম পড়ে গেল।... এ কীরকম নারদ! এ যে দেখি ফিটফাট জামাইবাবু।" (নিতাই ঘটক, চলচ্চিত্রে নজরুল ঃ স্মৃতির আলোয়; নজরুল একাডেমী পত্রিকা, হেমন্ত সংখ্যা, ১৯৯৩, ঢাকা)!

একজন মুসলমান যুবকের স্বনামে নারদ চরিত্রে অভিনয়ই ছিল বিতর্কিত ঘটনা, তারপর এই যুবক অভিনেতাটি আবার নারদের চিরাচরিত মুনি ঋষি'র বেশবাস ছেড়ে হালনাগাদ পরিচ্ছদ গ্রহণ করেছেন!

চলচ্চিত্রের আলোচক, ইতিহাস লেখক সে সময়ে কেমন ভাবে গ্রহণ করেছিলেন ধ্রুব ছবিটি! 'বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস' (১৯৬১, কলকাতা) গ্রন্থের লেখক কালীশ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "ধ্রুব অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরণের চিত্র হিসেবে নিন্দিত হয়।" সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা-য় (১৯৮৩) অরুণ চট্টোপাধ্যায় ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা দেশে প্রকাশিত গগেন্দ্রনাথের লেখা থেকে উদ্ধৃত করেছেন, "থিয়েটার বা যাত্রা ভাবপ্রধান চিত্রনাট্য।... সুতরাং, সাধারণত নৃত্যগীত প্রধান চিত্রনাট্যে যা হয়ে থাকে এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। 'ধ্রুব' হয়েছে একখানি যাত্রান্ত রিত মঞ্চাভিনয়।" আবার দৈনিক ইত্তেফাক-এ প্রকাশিত (মে ২৬, ১৯৮৩) ফিরোজ আহমদ 'চলচ্চিত্রে বিদ্রোহী কবি' নিবন্ধে লিখেছেন, "নজরুল নেমেছেন নারদের ভুমিকায়- সেটাই ছিল প্রধান আকর্ষণ। ছবিটা বহুদিন হাউজফুল চলেছিল।" আর সারওয়ার হুসেন লিখেছেন,

> "১৯৩৩ সাল। কলকাতার বড় দিনের আসর মাতিয়ে তুলেছে দেবকী বাবুর 'চণ্ডীদাস'। দেখতে ছুটে গেলাম দেশ থেকে, পথে দেখলাম বড় একটা প্রচারপত্র তাতে সে যুগের বাংলা ছবি পায়োনিয়ার ফিল্মস-এর 'ধ্রুব'-এর বিজ্ঞাপন দেওয়া। ভুমিকায় কারা ছিলেন ঠিক মনে নেই, যুগ্ম পরিচালক ও নারদের ভুমিকায় কাজী নজরুল ইসলামের নাম কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে। সে যুগে ফিল্মে-রেডিওতে দুরের কথা রেকর্ডেও বাঙ্গালী মুসলমান বলতে কারোর নাম ছিল না। দু-একজন যারা ছিলেন তারাও আত্মগোপন করেছিলেন ছদ্মনামে। সুতরাং মুসলমানের সঠিক নাম দেখেই আমার কৌতূহল হল। ধ্রুব দেখলাম এবং কাজী সাহেবকেও দেখলাম চিরকুমার নারদ রূপে, মানে 'ক্লীন সেভড' নারদ। সে যুগে এ কথাই শুধু মনে হত বাঙ্গালী মুসলমান হয়ে কাজী সাহেব কি করে এতটা সাহস পেলেন।" (চিত্র শিল্পে নজরুল, সিনেমা, মে, ১৯৫৩, ঢাকা।)

নিতাই ঘটকের সৌজন্যে কাজী নজরুল ইসলামের বক্তব্য শোনা যাক,

> "আমার নতুন সাজ দেখে অনেকেই আতঙ্কিত হয়েছেন কিন্তু নারদের বয়সের উল্লেখ কোথাও কি আছে? তাঁকে বৃদ্ধ বৈরাগী বেশে দেখানো হয়েছে কোন প্রমাণের ওপর নির্ভর করে? বরং তাঁকে চির তরুণ রূপেই সকলের জানা আছে। আমি সেই চির তরুণ, চির সুন্দর সকলের প্রিয় নারদেরই রূপ দেবার চেষ্টা করেছি।"

মাত্র আড়াই বছর সবাক ছবির বয়স। মুক্তির তারিখ অনুসারে পুর্ণদৈর্ঘ্য সবাক ছবি ধ্রুব হলো তেইশতম চলচ্চিত্র। সঙ্গীত বহুল মেলোড্রামা ধ্রুব'র ১৮টি গানের মধ্যে ১৭টি কাজী নজরুল

©Mukto-Mona
www.mukto-mona.com

রচনা করেছিলেন, বাকি গানটি ‘ধ্রুব চরিত’ নাটকের রচয়িতা গিরিশ চন্দ্র ঘোষ। বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে প্রকাশিত নজরুল রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে উল্লেখ আছে,

> “ ১৩৪০ সালের অগ্রহায়ণে কাজী নজরুল ইসলাম প্রধান পরিচালক এবং শ্রীনিত্যানন্দ ঘটক (ওরফে নিতাই ঘটক) সহকারী পরিচালকরূপে পাইওনিয়ার ফিল্মস কোম্পানির ‘ধ্রুব’ ছায়াচিত্রের সঙ্গীত রচনা ও সুর-যোজনা করেন। নজরুল এই নাটকের ১৭টি গান রচনা করেন। তিনি তাঁর তিনটি গান একক কণ্ঠে এবং একটি গান প্রবোধবাবুর সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন।”

‘ধ্রুব’ ছবির পরিচালনায় নজরুলের নাম নিয়ে নীরব বিতর্ক দীর্ঘদিন থেকেই চলছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এর যুগ থেকে আলোচিত অভিনেতা সত্যেন্দ্রনাথ দে ধ্রুব ছবির একজন পরিচালক এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি, বিতর্ক ঘুরছে কবি কাজী নজরুল ইসলামও ওই ছবির যুগ্ম পরিচালক ছিলেন সেই তথ্য নিয়ে। নজরুল ইসলাম ধ্রুব ছবির সঙ্গীত পরিচালক, গীতিকার এবং নারদের ভুমিকায় অভিনয় করে দায়িত্ব পালন করেছেন এই তথ্যও বিতর্ক রহিত। ধ্রুব ছবির সঙ্গীত পরিচালক কবি কাজী নজরুলের সহকারী নিতাই ঘটক তার স্মৃতি কথাতে সত্যেন্দ্রনাথ দে-কেই ছবির পরিচালক হিসেবে দেখিয়েছেন। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত নজরুল রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে নজরুলকে শুধু প্রধান সঙ্গীত পরিচালক, গীতিকার এবং কণ্ঠশিল্পী হিসেবেই দেখানো হয়েছে। চলচ্চিত্রের জন্মসাল ১৮৯৬ সাল থেকে ভারতবর্ষ বৃটিশের কবল থেকে আজাদ পাওয়ার সাল ১৯৪৭ পর্যন্ত সময়কালের চলচ্চিত্রের ইতিহাস নিয়ে ‘বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস’ গ্রন্থের প্রণেতা ফরিদপুরের কালীশ মুখোপাধ্যায় কাজী নজরুল ইসলামকে ধ্রুব ছবির যুগ্ম পরিচালকদের একজন হিসেবে উল্লেখ করেন নি। কালীশ বাবুর উক্ত ইতিহাস গ্রন্থে আরও কিছু খবর উপেক্ষিত হওয়ার কথা বলার আগে এই তথ্যটির ফয়সালা হওয়া দরকার। নজরুল ইসলাম কি সত্যিই যুগ্ম পরিচালকদের একজন ছিলেন! নিতাই ঘটক কালীশ মুখোপাধ্যায় এমন কি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত রচনাবলীর কোথাও নজরুলের ধ্রুব পরিচালনার খবরটি নাই। একাডেমী ধ্রুব সংক্রান্ত উক্ত তথ্য সংগ্রহ করে নজরুল ইনস্টিটিউট থেকে, অর্থাৎ নজরুল ইনস্টিটিউটের কাছেও পরিচালক হওয়ার কোনো দলিল নাই। সারওয়ার হুসেন মুখে মুখে সাক্ষাৎ দিচ্ছেন, কেন্দ্রীয় চরিত্রে যারা অভিনয় করেছেন তাদের কারও নাম মনে না থাকলেও যুগ্ম পরিচালক হিসেবে নজরুলের নাম উনি বিজ্ঞাপনে দেখেছিলেন। সেই সময়ে আলোচিত আঙ্গুরবালা, পারুলবালা, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনেতাদের একজনের নামও তিনি তার স্মৃতিচারণায় মনে করতে পারলেন না। হুসেন সাহেবের এই রকম স্মৃতির ওপর ভরসা না করে নজরুল ইনস্টিটিউট, নজরুল গবেষকদের উচিৎ সকল তথ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগে সেই সময়ের পত্র পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও পাইওনিয়ার ফিল্মস এর কাগজ পত্র, আর্কাইভ, লাইব্রেরি থেকে প্রকৃত তথ্যটি দলিল সমেত সংরক্ষণ করা। প্রসঙ্গত নজরুল গবেষক রফিকুল ইসলাম তার আলোচিত গ্রন্থ ‘কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও

©Mukto-Mona
www.mukto-mona.com

সাহিত্য' গ্রন্থেও ধ্রুব ছবির যুগ্ম পরিচালক হওয়ার কথা উল্লেখ করেন নি। অন্যদিকে চলচ্চিত্র সাংবাদিক লেখক অনুপম হায়াৎ একাধিক প্রবন্ধে জনাব সারওয়ার হুসেনের স্মৃতির বরাত দিয়ে যুগ্ম পরিচালকের তথ্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। হায়াৎ সাহেব অবশ্য প্রণব কুমার বিশ্বাসের 'বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস' গ্রন্থটি থেকে কোনো উদ্ধৃতি ব্যবহার না করে শুধু বইটির নাম সুত্র দিয়ে প্রণব বাবুকেও সাক্ষ্য মেনেছেন।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত রূপ-মঞ্চ পত্রিকার সম্পাদক, বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস গ্রন্থের লেখক কালীশ মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক তথ্য বিশেষ করে নজরুল বিষয়ক তথ্য বয়ানে যে শীতল উপেক্ষা দেখিয়েছে তার কিছু উল্লেখ জরুরি বৈকি। এই প্রসঙ্গে নজরুলের চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টতার ইতিহাসও জানা হয়ে যাবে। ধ্রুব ছবির সঙ্গীত পরিচালক, গীতিকার এবং নারদ চরিত্র ব্যতিক্রমী রূপায়ণের আগে কাজী নজরুল ইসলাম আরও একটি গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, অথবা বলা যায় নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, দৈনিক বঙ্গবাণী ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ সংখ্যার একটি সংবাদ পরিবেশিত হয় :

> "ম্যাডান থিয়েটারস লিমিটেড বাঙ্গালা গানের টকি নির্মাণ করিতেছেন। প্রসিদ্ধ কবি ও সঙ্গীতকার নজরুল ইসলামকে সুরভাণ্ডারী নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহাদের এ মনোনয়ন যথার্থ হইয়াছে, কারণ অধুনা বাংলার তরুণ কবিদের মধ্যে নজরুল ইসলাম রচয়িতা ও সুরকার হিসেবে শ্রেষ্ঠ। বর্তমানে কিছুকাল ম্যাডান কোম্পানী নট-নটীদের স্বর পরীক্ষার জন্য কেবল গান আবৃত্তির সবাক চিত্রই নির্মাণ করিবে।"

নির্বাকযুগের অবসানের পর পর পার্সি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান ম্যাডান থিয়েটারস সবাক ছবি নির্মাণের শুরুতে নজরুল ইসলামকে এই দায়িত্বে নিয়োগ করে। 'সুরভাণ্ডারী' নজরুল ইসলামের দায়িত্ব ছিল নতুন আবির্ভুত সবাক ছবিতে অংশগ্রহণকারী অভিনেতা অভিনেত্রীদের কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করা। নজরুল ইসলাম সুর ভাণ্ডারী'র নিয়োগপ্রাপ্তির পর ম্যাডান থিয়েটারস ৩০-৪০টি সবাক স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র পরীক্ষামুলকভাবে তোলে। এর মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম স্বকণ্ঠে তাঁর লেখা 'নারী' কবিতাটিও ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। অর্থাৎ সবাক চিত্রের সুচনালগ্নে নজরুল ইসলাম প্রত্যক্ষভাবেই ভুমিকা রাখেন। যদিও কালীশ বাবু নজরুল ইসলামের সঙ্গীত পরিচালকের ওপরে সুরভাণ্ডারী পদে নিয়োগ, এবং সবাক চিত্রে নজরুলের নিজ কণ্ঠে 'নারী' কবিতা পাঠের কথা তার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেন নাই। অবশ্য কালীশ বাবু এবং গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ ১৯৩১ সালের ১৩মার্চ তারিখে মুক্তি প্রাপ্ত ম্যাডানের নির্বাচিত ৩০/৪০টি খণ্ডচিত্রের অনেকগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। অশোক কুমার মিত্র 'নজরুল প্রতিভা পরিচিতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "... যখন কেবলমাত্র সংক্ষিপ্ত নমুনামুলক বাংলা সবাক চিত্র ম্যাডান থিয়েটারস লিমিটেড কর্তৃক পরিবেশিত হয়, তখনই আমরা দেখিয়াছি সবাকচিত্রের মাধ্যমে কাজী নজরুলকে, বলিতে শুনিয়াছি তাহার

©Mukto-Mona
www.mukto-mona.com

উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি ঃ সাম্যের গান গাই/আমার চক্ষে পুরুষ ও নারী/ কোন ভেদাভেদ নাই। বাংলা সবাক চিত্রে ছায়াচিত্রের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এমন অবিস্মরণীয় আরও ঘটনা কালীশ বাবু বেমালুম চেপে গেছেন। প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী পরিচালিত কালী ফিল্মস প্রযোজিত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে নির্মিত হয় 'পাতালপুরী' ছবিটি। 'পাতালপুরী' মুক্তি পায় রূপবাণী সিনেমা হলে ১৯৩৫ সনের ২৩ মার্চ। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন এই ছবির গীতিকার এবং সঙ্গীত পরিচালক। নামমাত্র ভুমিকায় তিনি অভিনয়ও করে ছিলেন। কিন্তু কালীশ বাবু পাতালপুরীর সকল বিভাগের কলাকুশলীর নাম যথাযথভাবে উল্লেখ করলেও জনপ্রিয়, আলোচিত গীতিকার সুরকার সঙ্গীত পরিচালকের নামটি উল্লেখ করলেন না! অথচ 'পাতালপুরী' ছবির গান বাংলা সঙ্গীত জগতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। সাঁওতালি ও ঝুমুর তাল মিশিয়ে নতুন এক ঝুমুর সৃষ্টি করেছিলেন, যা, 'নজরুলের ঝুমুর' নামে পরিচিত। পাতালপুরী ছবির কাহিনী গড়ে ওঠে কয়লা শ্রমিকদের জীবন প্রেম দুঃখ বেদনা নিয়ে। গানের সুর আবহ ও কথা রচনার আগে নজরুল নিজে বর্ধমানের কয়লাখনি অঞ্চলে গিয়েছিলেন সঙ্গীতের প্রয়োগ ও প্রাসঙ্গিকতা বোঝার জন্য। সমালোচকরা ছবিটির নিন্দা করলেও গানের প্রশংসা করেছিলেন। কালীশ বাবু গৌরাঙ্গ বাবু সঙ্গীত পরিচালকের নামটাও উল্লেখ করার প্রয়োজনবোধ করেন নাই তাদের রচিত ইতিহাস গ্রন্থে। নজরুলের গানের প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব বুদ্ধদেব বসুর লেখা 'নজরুল ইসলাম' নিবন্ধের কিছু মন্তব্য বা কটাক্ষ স্মরণ করা যেতে পারে,

> "কত গান সুন্দর আরম্ভ হয়েছে, সুন্দর চলে এসেছে, কিন্তু শেষ স্তবকে কোনো একটা অমার্জিত শব্দ প্রয়োগে সমস্ত জিনিসটিই গেছে নষ্ট হয়ে। তাঁর প্রেমের গান সরস, কমনীয়, চিত্রবহুল; কিন্তু তার আবেদন আমাদের মনে যখনই ঘন হয়ে আসে তখনই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, কোনো স্থূল স্পর্শে মোহ ভেঙে যায়। গীতরচয়িতার অন্য সমস্ত গুণ তাঁর ছিলো– শুধু যদি এই দোষ না থাকতো, শুধু যদি তাঁর রুচি হতো পরিশীলিত, তাহলে তার মধ্যে একজন মহৎ গীতকারকে আমরা বরণ করতে পারতাম।"

এই উদ্ধৃত্তি শুরুর আগের বাক্যে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, ..."আরো বেশি গান যে অনিন্দ্য হয়নি, তার কারণ নজরুলের দুরতিক্রম্য রুচির দোষ।" (প্রবন্ধ সংকলন, বুদ্ধদেব বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৮২) অবাক হতে হয়, দুরতিক্রম রুচির দোষ এবং স্থূলতার একটি উদাহরণও তিনি উল্লেখ করেননি। চলচ্চিত্রে নজরুলের সংশ্লিষ্টতার প্রধান দিকই এই সঙ্গীত। চলচ্চিত্রের প্রযোজক, পরিবেশক পরিচালকদের কাছে সাহিত্য ব্যক্তিত্ব নজরুলের গুরুত্বও ছিল সঙ্গীতের জন্য। অবশ্য নজরুলের ব্যক্তিত্বও ছিল বাড়তি পাওয়ানা। প্রসঙ্গত 'ধ্রুব' ছবির সহকারী সঙ্গীত পরিচালক নিতাই ঘটকের স্মৃতি স্মরণ করা যাক,

> "দুটি চুক্তি পত্রই (ধ্রুব ছবির) পড়ে দেখলাম, কবির পত্রে লেখা আছে, যতদিন ছবির মিউজিক গ্রহণের কাজ চলবে তিনি মাসিক ৫০০ টাকা করে পাবেন, আর আমার মাত্র চুক্তি মাসিক ৫০ টাকা মাত্র একই সময়ের

©Mukto-Mona
www.mukto-mona.com

জন্য। এরপর এক অদ্ভুত অনুরোধ এল ম্যাডান কোম্পানীর প্রোপাইটার ফ্রামজী ম্যাডান সাহেবের কাছ থেকে; তিনি কবিকে এই ছবিতে 'নারদ' এর ভুমিকায় অবতীর্ণ হতে বললেন, তাঁর ধারণা এতে 'বক্স অফিসের আকর্ষণ বাড়বে।"

বিদ্যাপতি ছবির কাহিনীকার, সংলাপ রচয়িতা গীতিকার সুরকার নজরুল ইসলাম। কালীশ বাবু 'বিদ্যাপতি'র নির্মাণের খবর ছাপালেও ছবির কাহিনীকার এবং অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব নজরুল ইসলামের নামটি উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেন না। যদিও তিনি অন্যান্য নির্মীয়মান ছবি যেমন, 'খুনের জোর'– এর নরেশ সেনগুপ্ত, 'কৈকেয়ী'র বসন্ত চট্টোপাধ্যায়, মুক্ত 'হওয়া'র কাহিনীকার প্রভাবতী দেবীর নাম ঠিকই উল্লেখ করেছেন। নজরুল ইসলামের কাহিনী, সঙ্গীত ও সুরে 'বিদ্যাপতি' মুক্তি পায় ১৯৩৮ সনের ২ এপ্রিল চিত্রা সিনেমায়। বিদ্যাপতি'র পরিচালক ছিলেন দেবকী কুমার বসু।

একই বছর, ১৯৩৮ এর ৩০ জুলাই চিত্রাতেই মুক্তি পায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা'র চিত্ররূপ, পরিচালক বিখ্যাত অভিনেতা নরেশ মিত্র, গোরার সঙ্গীত পরিচালক এবং একটি গানের রচয়িতা ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। এই প্রথম বাঙলার এই দুই প্রধান সাহিত্য ব্যক্তিত্বের কাজ এক সঙ্গে দেখার সুযোগ ঘটে। যদিও তা বিতর্করহিত ছিল না। বিশ্বভারতীর সঙ্গীত বোর্ড এর অনুমোদন না নিয়ে সঙ্গীত পরিচালক নজরুল গোরা ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহার করায় সঙ্গীত বোর্ড ছবির মুক্তি আটকে দেয়। তখন ট্রেড শো শুরুর মাত্র দুই তিন দিন বাকি। পরিচালক নরেশ মিত্র স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চিত্রনাট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন, চিত্রনাট্য রবীন্দ্রনাথ দেখেও দিয়েছিলেন। আত্মবিশ্বাসী নজরুল ভেবেছিলেন তার সঙ্গীত পরিচালনা নিয়ে বিশ্বভারতী আপত্তি করবে না। বিশ্বভারতী করে, বিশ্বভারতী বা সঙ্গীতবোর্ড তো আর রবীন্দ্রনাথ নন। নজরুল ইসলামের পরিচালনায় গীত গানগুলি ত্রুটিমুক্ত নয় বলে অভিমত প্রকাশ করে ছবির মুক্তি বন্ধ করে দেবার পর নজরুল ইসলাম কি করলেন! 'রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল' প্রবন্ধের (কারক; নজরুল, সংখ্যা ১৯৯৯) লেখক বিশ্বনাথ রায়ের মন্তব্য, "বিশ্বভারতীর প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-নীতিতে সাধারণত হস্তক্ষেপ করতেন না রবীন্দ্রনাথ, তাছাড়া ঘটনাটি তাঁর অগোচরেই ছিল।" তবু নজরুল ইসলাম ছুটলেন তাঁর নিজের ব্যক্তিগত তীর্থ রবীন্দ্রনাথের কাছেই। 'রবীন্দ্রনাথের চোখে নজরুল' (১৯৯৮) গ্রন্থের লেখক বাঁধন সেনগুপ্ত'র কাছ থেকেই বাকিটা শোনা যাক,

"নজরুল সঙ্গে সঙ্গে একটি মোটর গাড়িতে 'গোরা' ফিল্মের প্রিণ্ট আর একটি ছোট প্রোজেকশন মেশিনসহ দেবদত্ত ফিল্মসের ... মানু গাঙ্গুলীকে নিয়ে সোজা শান্তিনিকেতনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। গুরুদেব হঠাৎ নজরুলকে দেখতে পেয়ে বিস্মিত। আনন্দিত হয়ে নজরলের কুশলাদি জেনে নেবার পর কবি বলেছিলেন, এসেছোই যখন কয়েকদিন তাহলে আমার কাছে থেকে যাও। নজরুল আশ্বস্ত হয়ে উত্তর দিলেন, সে তো আমার সৌভাগ্য– কিন্তু এখন যে এক ভীষণ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। এরপর কাজী সাহেব 'গোরা' ছবির গানের অনুমতি না নেওয়াজনিত সঙ্কটের কথা রবীন্দ্রনাথের

©Mukto-Mona
www.mukto-mona.com

সামনে খোলাখুলি স্বীকার করে উদ্ভুত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্বকবিকে অবহিত করলেন। ... গুরুদেব সব কিছু শুনে খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন – কি কাণ্ড বলত? তুমি শিখিয়েছ আমার গান আর ওরা কোন আক্কেলে তার দোষ ধরেন? তোমার চেয়েও আমার গান কি তারা বেশি বুঝবে! আমার গানের মর্যাদা কি ওরা বেশি দিতে পারবে? নজরুল সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কিন্তু লিখিত অনুমতি না পেলে সামনের ঘোষিত তারিখে ছবিটার মুক্তি দেওয়া যাবে না। আপনি দয়া করে আজ একসময় ছবিটা দেখুন– আমি প্রোজেক্টর ও ফিল্ম সঙ্গে করে এনেছি। তারপর অনুমতি পত্রে একটা সই করে দিন।

বিশ্বকবি বললেন, 'ছবি দেখাতে চাও সকলকেই দেখাও, সবাই আনন্দ পাবে। আপাতত দাও, কিসে সই করতে হবে।' এই বলে নজরুলের হাত থেকে আগে থেকেই লিখে রাখা অনুমতি পত্র নিয়ে তাতে সই ও তারিখ দিয়েছিলেন। নির্দিষ্ট দিনেই ছবিখানি যথারীতি মুক্তি পেল।"

'গোরা' ছবিতে এরপর নজরুল নিজের লেখা একটা গানও জুড়ে দেন।

'গোরা' ছবিতে নজরুল ইসলামের সঙ্গীত পরিচালনা এবং এই অভাবিত পরিস্থিতির জন্য তখন চলচ্চিত্রপাড়ায় আলোচিত খবর হয়ে ওঠে। শুধু তত গুরুত্ব পায় না কালীশ বাবুর ইতিহাস গ্রন্থে, যেখানে তিনি পরিচালক, প্রযোজক, পরিবেশক, আলোকচিত্রী, সহকারী আলোচকচিত্রীসহ রসায়নাগারের সহকারীর নাম উল্লেখ শেষে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে নজরুল ইসলামের নামটি লেখেন। চলচ্চিত্র সাংবাদিক, লেখক কালীশ মুখোপাধ্যায় ঠিকই জানেন সঙ্গীত পরিচালকের গুরুত্ব এবং সম্মানের কথা, কারণ একই সময়ে মুক্তি পাওয়া রবীন্দ্রনাথের কাহিনী নিয়ে ছবি চোখের বালি'র সঙ্গীত পরিচালক অনাদি দস্তিদারের নাম সম্মানের সঙ্গে পরিচালক, আলোকচিত্রীর পরেই উল্লেখ করেছেন। চলচ্চিত্রে নজরুলের ভুমিকার আরও আরও তথ্য কালীশ বাবু এড়িয়ে গেছেন। প্রায় একই রকমভাবে গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষের চার শতাধিক পৃষ্ঠার সচিত্র 'সোনার দাগ' (যোগমায়া প্রকাশনী, কলকাতা) গ্রন্থেও নজরুল বিচ্যুতি ঘটেছে, এই বিচ্যুতি, উপেক্ষার হয়তো ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক কারণ আছে, এই প্রবন্ধের জন্য তার ব্যাখ্যা জরুরি নয়। আপাতত, অন্যের উপেক্ষার ফিরিস্তি না করে চলচ্চিত্রে নজরুলের আরও কিছু সক্রিয় ভুমিকার খোঁজ করা যাক। ১৯৩৯ সালের ২৭ মে তারিখে মুক্তি পায় সাপুড়ে ছবিটি। পরিচালক দেবকী কুমার বসু। 'সাপুড়ে' ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ, গীত ও সুর তৈরি করেছিলেন নজরুল ইসলাম। এর আগে, ১৯৩৭ সালের ৪ ডিসেম্বর তারিখে মুক্তি প্রাপ্ত হত্যা, রহস্য, রোমাঞ্চ, প্রেম ভালোবাসা নির্ভর 'গ্রহের ফের' ছবির সঙ্গীত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন নজরুল ইসলাম। 'গ্রহের ফের' ছবির সংলাপ লেখেন আর একজন সাহিত্য চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র আর ছবিটি পরিচালনা করেন চারু রায়।

কাজী নজরুল ইসলামের আশৈশব বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এর কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায়, কুমুদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় কে, বি পিকচার্সের ব্যানারে 'নন্দিনী' ছবিটি

©Mukto-Mona
www.mukto-mona.com

মুক্তি পায় বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য বছর ১৯৪১ সালের ৮ নভেম্বর তারিখে। এ বছর উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান রবীন্দ্রনাথ এর প্রয়াণ ঘটে, চলচ্চিত্র জগতেও কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার জন্ম হয়। সে প্রসঙ্গ অবতারণার আগে বলা প্রাসঙ্গিক যে, 'নন্দিনী' ছবির ৯ টি গানের মধ্যে নজরুল ইসলাম একটি গানের রচয়িতা ও সুরকার হলেও বিষয়টি হয়ে ওঠে তাৎপর্যপুর্ণ। নজরুলের লেখা 'চোখ গেল চোখ গেল' গানটি ছবিতে আবহ সঙ্গীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর কণ্ঠ দেন সঙ্গীতের আরেক আলোচিত ব্যক্তিত্ব শচীন দেব বর্মন। নজরুল 'নন্দিনী'র সঙ্গীত পরিচালক না হয়েও ছবির মুড বুঝে শচীন দেব বর্মনের কণ্ঠে গানটি অনায়াস করে তুলতে যথেষ্ট ভোগেন। এর কারণ শচীনের গলার বিশিষ্টতা।

বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এর কাহিনী, পরিচালনায় নির্মিত 'অভিনয় নয়' ছবির ৭টি গানের ১টি গান ঝুমুরতালের 'ও শাপলা ফুল নেবনা, বাবলা ফুল এনে দে' গানটি নজরুল ইসলাম রচনা করেছিলেন। 'অভিনয় নয়' মুক্তি পায় ১৯৪৫ সালের ২ মার্চ। কাজী নজরুল ইসলাম অসুস্থ হওয়ার পর মুক্তি প্রাপ্ত ছবি সাহিত্যিক প্রেমাংকুর আতর্থী পরিচালিত 'দিকশুল' ছবির পাঁচটি গানের দুটি লিখেছিলেন নজরুল, 'দিকশুল' এর সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে ছিলেন পংকজ কুমার মল্লিক, গান দুটি'র সুরও দিয়েছিলেন পঙ্কজ মল্লিক।

কলকাতায় ১৯৪২ সালের ৯ জুলাই তারিখে নজরুল ইসলাম অসুস্থ হন। এর ৫ দিন আগে ৪ জুলাই নিউ সিনেমায় হিন্দী চৌরঙ্গী মুক্তি পায়। বাংলা 'চৌরঙ্গী' মুক্তি পায় কলকাতার রূপবাণীতে ১৯৪২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর। সঙ্গীত পরিচালক নজরুল ইসলাম বাংলা চৌরঙ্গীর ৯টি গানের ৮টি গান লেখেন, সুর দেন, কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন সংলাপ, পরিচালনা করেন নবেন্দু সুন্দর এবং প্রযোজক, কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার এস ফজলী।

হিন্দী ভার্সন চৌরঙ্গী এস ফজলী নিজেই পরিচালনা করেন, নবেন্দু সুন্দর ছিলেন তার সহকারী। হিন্দী চৌরঙ্গীর ১৩ টি গানের মধ্যে নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন ৭ টি। নজরুলের লেখা হিন্দী গানগুলো ছিল, ১. চৌরঙ্গী হ্যায় ইয়ে চৌরঙ্গী ২. সারাদিন ছাদ পিটি ৩. আ-জারি নিদিয়া ৪. উহ্ করকে হায় ৫. ক্যায়সে মিলান ৬. হাম ইসকে মারোঁকা, গানের সুরও দিয়েছিলেন নজরুল। চৌরঙ্গীর আগে কাজী নজরুল ইসলামের কাহিনী, গান, সুর, চিত্রনাট্য ও সংলাপ নিয়ে বাংলার পাশাপাশি হিন্দীতেও 'বিদ্যাপতি' ও 'সাপুড়ে' ছবি দুটি হয়েছিল।

নজরুলের গুরুদেব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৪১ সালে ৭ আগষ্ট মৃত্যুবরণ করেন। কলকাতার বেতার কেন্দ্র সন্ধ্যায় কবির মৃত্যু উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য নজরুলের কাছে কবিতা

©Mukto-Mona
www.mukto-mona.com

চেয়ে পাঠায়। শোকার্ত মর্মাহত নজরুল 'রবিহারা' কবিতাটি লিখে নিজে এসে বেতারে পাঠ করেন।

দুপুরের রবি পড়িয়াছে ঢলে অস্ত পথের কোলে
শ্রাবণের মেঘ ছুটে এল দলে দলে
উদাস-গগন-তলে;
বিশ্বের রবি ভারতের কবি
শ্যাম বাঙলার হৃদয়ের ছবি
তুমি চলে যাবে বলে।

রবিহারা নজরুল উদাস গগন তলে একটি ঐতিহাসিক ভুমিকা পালন করতে তৈরি হলো। অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক সাহেবের সহযোগিতায় কলকাতায় বাঙালি মুসলমানের প্রথম চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল টাইগার পিকচার্স' সংক্ষেপে বিটিপি গঠন করেন। নজরুল ইসলামের সঙ্গে ছিলেন ওস্তাদ মুহম্মদ হোসেন খসরু, সঙ্গীত শিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমেদ, আজিজুল ইসলাম, চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব সারওয়ার হুসেন; পরে যোগ দেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, সাহিত্যিক এস ওয়াজেদ আলী, সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বের। বেঙ্গল টাইগার পিকচার্স থেকে নিজের লেখা গীতি আলেখ্য 'মদিনা' নামের একটি ছবি তৈরির প্রস্তুতি গ্রহণ করেন নজরুল। মদিনা নাটকে ছিল ৪৩ টি গান, আর চলচ্চিত্র মদিনায় নজরুল রাখতে চেয়েছিলেন ১৫ টি গান। নাচ গান প্রধান গীতি আলেখ্যর গল্প তেমন ব্যতিক্রম কিছু নয়, নায়ক নৌজোয়ান, তাকে সবাই ভালোবাসে। মহারাজার পর্দানশিল মেয়ে 'মদিনা'ও এই নৌজোয়ানকে ভালোবেসে ফেলে। দুর্ভাগ্য এই যে এই 'মদিনা' নাটক এবং পাণ্ডুলিপিটি নজরুল রচনাবলীতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কলকাতার নজরুল গবেষক লেখক আব্দুল আজিজ আল আমান প্রথম 'মদিনা' রচনাটি উদ্ধার করেন, এবং ঢাকার নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকায় 'নজরুলের অপ্রকাশিত নাটক মদিনা' ছাপা হয়। 'মদিনা' শেষ পর্যন্ত চলচ্চিত্রায়িত হতে পারে না। নজরুল ইসলাম ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪২ সালের জুলাই পর্যন্ত লেখা, গান, সাংবাদিকতার সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার প্রধান দিক সঙ্গীত হলেও নজরুল সংলাপ ও চিত্রনাট্য রচনা, কাহিনী নির্মাণ, কখনো কখনো অভিনয়ও করেন। প্রায় এক যুগের এই চর্চা হলেও নজরুল চলচ্চিত্র মাধ্যম সম্স্লর্কে, এর শিল্পরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে কিছু লেখেননি। কোনো ভাষণ অভিভাষণেও এই নতুন মাধ্যমটি নিয়ে তাঁর তেমন

©Mukto-Mona
www.mukto-mona.com

বক্তব্যের খোঁজ এখনো মিলেনি। চলচ্চিত্রে তাঁর ভুমিকা এবং যা যা তিনি সম্পন্ন করেছেন তার দিকে সাধারণ চোখে তাকালেও বোঝা যায়, কাজী নজরুল ইসলাম চলচ্চিত্রকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম শিল্প মাধ্যম হিসেবে অথবা চলচ্চিত্র শিল্পের শক্তি ও প্রকৃতি তিনি তেমন করে বুঝে উঠতে পারেননি। চলচ্চিত্রের ভাষা, বোধ, রূপ প্রবাহের নিজস্ব শক্তি, তার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, শিল্পসম্ভাবনা নিয়ে নজরুল কি ভেবেছিলেন? চলচ্চিত্র জড়িয়ে পড়ার আগে নজরুল মঞ্চে নাটক, তার আগে যাত্রায় একই রকমভাবে কাহিনী, গান অভিনয় এমন কি নির্দেশনায়ও ব্যস্ত ছিলেন। এই মঞ্চের প্রভাব চলচ্চিত্রেও অত্যন্ত দৃষ্টিগ্রাহ্য ও শ্রবণগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। চড়া সংলাপ, মেলোড্রামা, মুহূর্তে মুহূর্তে গানের অভিযোগ নজরুলের সংশ্লিষ্ট প্রায় সব ছবি সম্পর্কেই বলা যায়।

অস্থির, চঞ্চল, সৃষ্টির উন্মাদনায় ব্যাকুল নজরুল কিংবদন্তীতুল্য প্রতিভাবান হয়েও চলচ্চিত্রকে ‘চলচ্চিত্র শিল্প’ হিসেবে দেখার ফুরসত পাননি। নজরুল সরাসরি চলচ্চিত্রে জড়িয়ে পড়ার বছর দুই আগে নজরুলের পুজনীয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই আঁতুরঘরের শিল্পটির আত্মা স্বরূপ ও সম্ভাবনা বুঝে ফেলেছিলেন। তিনি ১৯২৯ সালের এক চিঠি নিবন্ধে লেখেন,

> “ছায়াচিত্রের প্রধান জিনিসটা হচ্ছে দৃশ্যের গতিপ্রবাহ। এই চলমান রূপের সৌন্দর্য বা মহিমা এমন করে পরিস্ফুট করা উচিত যা কোনো বাক্যের সাহায্য ব্যতিত আপনাকে সম্পূর্ণ সার্থক করতে পারে। তার নিজের ভাষার মাত্রার উপরে আর একটা ভাষা কেবলি চোখে আঙুল দিয়ে মানে বুঝিয়ে যদি দেয় তবে সেটাতে তার পঙ্গুতা প্রকাশ পায়। সুরের চলমান ধারায় সঙ্গীত যেমন বিনাবাক্যেই আপন মাহাত্ম লাভ করতে পারে তেমনি রূপের চলৎপ্রবাহ কেন একটি স্বতন্ত্র রসসৃষ্টিরূপে উন্মেষিত হবে না?”

চলচ্চিত্রের স্বতন্ত্ররস রবীন্দ্রনাথের মতো করে দেখার সুযোগ ও সামর্থ্য নজরুলের ছিল না, ছিল প্রকৃতির মতো সৃষ্টির ঝড়ো আবেগ, বিশৃঙ্খলা; আর বৈশাখী ঝড় অথবা বর্ষার জল প্রবাহের দরকার আছে জমির উর্বরতার জন্য।

©Mukto-Mona
www.mukto-mona.com